জীববৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়ন

Biodiversity and Sustainable Development

৫

প্রতিবেশের বসবাসকৃত জীবসমূহের ভিন্নতা হচ্ছে জীববৈচিত্র্যতা। আদ্র জলবায়ু অঞ্চলে সর্বাধিক এবং মেরু অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কম জীববৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দূষণের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জীববৈচিত্র্যতা হ্রাস পায়। এছাড়াও কোনো কোনো প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়, হুমকির সম্মুক্ষীণ হয় এবং সংকটাপন্ন প্রজাতি, প্রতিবেশ তৈরি হয়। বৃহৎ আঙ্গিকে বলা যায়, পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করতে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ অতীব জরুরী । সর্বোপরি বলা যায়, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশগত অবক্ষয় রোধকল্পে টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই বিশ্বে পরিবেশ সুরক্ষায় টেকসই উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। আলোচ্য অধ্যায়ে- জীববৈচিত্র্য, উপাদান, শ্রেণিবিভাগ ও বিশ্বের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : জীববৈচিত্র্য: উপাদান, শ্রেণিবিভাগ ও বিশ্বের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল
পাঠ - ৫.২ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
পাঠ - ৫.৩ : টেকসই উন্নয়নের ধারণা
পাঠ - ৫.৪ : টেকসই উন্নয়নের নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা

পাঠ-৫.১ জীববৈচিত্র্য: উপাদান, শ্রেণিবিভাগ ও বিশ্বের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল

Biodiversity:Elements, Classification and Rich Biodiversity Area in the World

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- জীববৈচিত্র্যের উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

জৈবিক বৈচিত্র্যতার (Biological Diversity) সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)[১]। ১৯৬৮ সালে রেমন্ড এফ ডেসমান (Raymond F. Dassmann) তাঁর A Different kind of Country নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম Biodiversity শব্দটি ব্যবহার করেন। পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবকূলসমূহের (উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের) প্রজাতিগত, জিনগত এবং প্রতিবেশভিত্তিক পার্থক্যকে জীববৈচিত্র্য বলে[২]। জীববৈচিত্র্য হচ্ছে ৩.৫ মিলিয়ন বছরের বিবর্তনের ইতিহাস। কার্বোনিফেরাস যুগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের ২৫১ মিলিয়ন বছর পূর্বে পার্মো-ট্রায়াসিক যুগে ডাইনোসর পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে কোনো ইকোসিস্টেমে বা প্রতিবেশে সকল প্রজাতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। প্রতিবেশের যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব প্রতিবেশের একটি প্রজাতির ওপর প্রভাব পড়লে অন্য প্রজাতির ওপরও প্রভাব পড়ে।

জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা

Definition of Biodiversity

জীববৈচিত্র্য শব্দটি প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং প্রজাতি প্রাচুর্য (Species richnes) শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হয়। মূলত যে কোনো অঞ্চলের গণ (genes), প্রজাতি (Species) ও প্রতিবেশের বা ইকোসিস্টেমের সামগ্রিক অবস্থা নির্দেশ করার জন্য জীববৈচিত্র্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে জীববৈচিত্র্যতার কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

ব্রুস এ উইলকক্স (Bruce A. Wilcox) এর মতে, "জীববৈচিত্র্য হচ্ছে - জৈবিক পদ্ধতির যে কোনো স্তরের জীবন গঠনের বিভিন্নতা"।

সি.জি. ব্যারো (C.J. Barrwo, 2005) এর মতে, "কোনো অঞ্চলে (প্রতিবেশে) বসবাসকারী প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে বংশগতির পার্থক্যসহ বিভিন্ন প্রজাতির বৈচিত্র্যই হচ্ছে জীববৈচিত্র্য"।

[1] Goston, Kevin J. (2000). Golobal patterns in biodiversity". Nature 405 (6783): 220-227 doi: 1038/35012228

[2] TiHensor, Derek P. Mora, Camilo; Jetz, Walter; Lotze, Heikek; Richard, Daniel; Berghe, Edwarde Vander; Worm, Boris (2010). ~Global patterns and Predictors of marine biodiversity arose taxas. Nature 466 (7310) : 1098-1101.

- প্রজাতিসমূহের প্রজাতি এবং ইকোসিস্টেমের পারস্পরিক সম্পর্ককে জীববৈচিত্র্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- ইউনাইটেড নেশনস এর পরিবেশগত প্রোগ্রাম (United Nations Environment Programme, UNEP) অনুযায়ী যে কোনো অঞ্চলের গণ, প্রজাতি ও প্রতিবেশের বা বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিকতাকে জীববৈচিত্র্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, জীবমণ্ডলে বসবাসকারী প্রাণীকূল ও উদ্ভিদকূলের মধ্যে বিদ্যমান সম্প্রদায়গত, জনসংখ্যাগত ও প্রজাতিগত বিভিন্নতাকে জীববৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্যতার উপাদান

Elements of Biodiversity

জীববৈচিত্র্যতা প্রতিবেশগত পদ্ধতি (Ecological System) এবং কার্যক্রম (functions) কে নিয়ন্ত্রণ করে। জীববৈচিত্র্যতাকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. বংশগতীয় বৈচিত্র্যতা (Genetic Diversity)
২. শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্য বা প্রজাতির বৈচিত্র্য (Taxonomic diversity or Species diversity)
৩. ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশ বৈচিত্র্যতা (Ecosystem Diversity)

১। **বংশগতীয় বৈচিত্র্যতা (Genetic Diversity):** বংশগতীয় বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতি নির্বাচনে এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখে বংশগতীয় বৈচিত্র্য। এছাড়া অঞ্চলগত ভিন্নতার (Regional Variation) কারণে একই প্রজাতির উদ্ভিদের পৃথক পৃথক অঞ্চলে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। বর্ণ, আকৃতি ও রোগের বিরূদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা জিন (Gene) দ্বারা নির্ধারিত হয়। জিন কোষের কাঠামো। যা বংশগত তথ্য বহন করে। এই জিনই জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। বংশগতীয় বৈচিত্র্য পপুলেশনকে পরিবর্তনশীল পরিবেশে খাপ খাওয়াইতে সহায়তা করে। এছাড়াও পপুলেশনের মধ্যে কিছু পপুলেশন সদস্যের এলিলির পরিবর্তন ঘটে যা পরিবেশের সাথে টিকে থাকতে সহায়তা করে। যার দরুন পপুলেশন বংশ পরম্পরায় টিকে থাকতে পারে। বংশগতীয় বৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বংশগতীয় পরিবর্তনের কারণে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। যা মূলত: জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তিকে পরিচালিত করে। জেনেটিক বা বংশগতীয় বিভিন্নতা যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে বা ইকোসিস্টেমে প্রজাতিসমূহের উৎপাদনশীলতা, পুনঃউৎপাদন, জটিল (Compound) পরিবেশিক অবস্থা এবং এর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, টিকে থাকার সামর্থ, অর্থাৎ অভিযোজনতার প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।

২। **শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্য বা প্রজাতির বৈচিত্র্য (Taxonomic diversity or Species diversity):** প্রতিবেশে বা ইকোসিস্টেমে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের বৈচিত্র্যতাই হলো প্রজাতিসমূহের বৈচিত্র্যতা। প্রজাতি বৈচিত্র্যতাকে শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্যও বলা হয়। ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণিবিন্যাসের মূল একক হলো প্রজাতি। প্রত্যেকটি প্রজাতির পৃথক যোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যার দরুন একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতি থেকে আলাদা। সুতরাং প্রজাতি বৈচিত্র্য বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, অনুজীব প্রভৃতির মোট প্রজাতির সংখ্যাকেই বোঝায়। প্রজাতি বৈচিত্র্যের প্রধান দুটি অংশ। যথা- প্রজাতি প্রাচুর্য (Species richness) ও প্রজাতি সমতা (Species evenness)। প্রজাতিসমূহের সরল গণনা হচ্ছে প্রজাতি প্রাচুর্য। প্রজাতির বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যতার ওপর প্রতিবেশের বা বাস্তুতন্ত্রের প্রাচুর্যতা, স্থায়িত্ব, পরিবেশের ভারসাম্য এবং প্রতিবেশের বা বাস্তুতন্ত্রের প্রাচুর্যতাও নির্ভর করে।

৩। **ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশ বৈচিত্র্যতা (Ecosystem Diversity):** ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশ বৈচিত্র্যতা প্রত্যক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে। যেমন প্রবাল প্রাচীর সমুদ্রের শতকরা ১ ভাগেরও কম জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এটি বিশ্বের শতকরা ২০ ভাগ লবণাক্ত পানির জীবের আবাসস্থল। এই প্রবাল প্রাচীরকে সমুদ্রের রেইনফরেস্টও বলা হয়, কারণ এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ ইকোসিস্টেম। যে কোনো পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক উপাদানসমূহের মধ্যে যে কোনো কারণে কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে উক্ত পরিবেশের ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে। এই

ধরনের পরিবর্তন ধীর এবং গতিশীল। উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের বসবাসকৃত পরিবেশের বৈচিত্র্যতা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেশভিত্তিক প্রক্রিয়ার জন্য প্রতিবেশের বিভিন্নতা তৈরি হয়। প্রতিবেশভিত্তিক বৈচিত্র্যতার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেশ বা বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়। পরিবেশের এই ধরনের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য উক্ত পরিবেশে বসবাসরত জীবদের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রতিবেশ জীববৈচিত্র্য বলে। প্রতিবেশের বৈচিত্র্যও জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে। বর্তমান সময়ের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ তথা মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল

Rich Biodiversity Area in the World

পৃথিবীর অধিকাংশ জীববৈচিত্র্যতা দেখা যায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে (নিরক্ষরেখার (Equator) পার্শ্ববর্তী অঞ্চল), ক্রান্তীয় আদ্র জলবায়ুপূর্ণ অঞ্চলে এবং সমুদ্রের কোরাল রিফ অঞ্চলে[৩]। এছাড়াও সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়, মহাসাগরসমূহের মধ্য অক্ষাংশে অর্থাৎ যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির তাপমাত্রা অধিক। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলেও অধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা কম জীববৈচিত্র্য দেখা যায় মেরু অঞ্চলে। স্থলজ জীববৈচিত্র্য, মহাসাগরীয় জীববৈচিত্র্য অপেক্ষা প্রায় ২৫ গুণ বেশি। বর্তমান পৃথিবীর সর্বমোট ৮.৭ মিলিয়ন প্রজাতির মধ্যে ২.১ মিলিয়ন প্রজাতি মহাসাগরে রয়েছে। আবার উষ্ণমণ্ডলে নীতিশোতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় জীববৈচিত্র্য অধিক। IUCN কর্তৃক সনাক্তকৃত বিশ্বে হুমকীর সম্মুক্ষীণ প্রজাতির (Species) সংখ্যার মধ্যে ফাঙ্গি, লিচেন (Fungi, lichens) এর প্রজাতি সংখ্যা সর্বাধিক (২৮১,৮২১ ৭৩), পোকামাকড় (Insects) এর সংখ্যাও অধিক (১,০০০,০০০), সনাক্তকৃত প্রজাতি সংখ্যার মধ্যে স্তন্যপায়ীর (Mammals) সংখ্যা ৫,৪৯১, পাখি (Birds) ৯,৯৯৮, উভচর (Amphibians) ৬,৪৩৩ (টেবিল-২.২.১)। পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে জীববৈচিত্র্যের অনেক প্রজাতি হুমকীর সম্মুক্ষীণ । হুমকীর সম্মুক্ষীণ প্রজাতির (Species) সংখ্যা টেবিল-৫.১ এ দেখানো হয়েছে।

টেবিল - ৫.১ IUCN কর্তৃক সনাক্তকৃত বিশ্বে হুমকীর সম্মুক্ষীণ প্রজাতির (Species) সংখ্যা[৪]

শ্রেণি	সংখ্যা	হুমকীর সম্মুক্ষীণ প্রজাতির শতকরা
স্তন্যপায়ী (Mammals)	৫,৪৯১	২১
পাখি (Birds)	৯,৯৯৮	১২
সরীসৃপ (Reptiles)	৯,০৮৪	২৮
উভচর (Amphibians)	৬,৪৩৩	৩০
মাছ (Fishes)	৩১,৩০০	৩২
পোকামাকড় (Insects)	১,০০০,০০০	২৭
মলাস্কা (Mollusks)	৮৫,০০০	৪৫
কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী (Crustaceans)	৪৭,০০০	৩৫
অন্যান্য অমেরুদন্ডী প্রাণী (Other invertebrates)	১৭৩,২৫০	৩০
জলাভূমি (Mosses)	১৬,২৩৬	৮৬
ফার্ণ (Ferns and allies)	১২,০০০	৬৬
জিমনোস্পার্ম (Gymnosperms)	১,০২১	৩৫
ফাঙ্গি, লিচেন (Fungi, lichens)	২৮১,৮২১ ৭৩	৭৩
প্রোটিস্ট (Protists)	৫১,৫৬৩	৫০

[3] Benton M. J. (2001) Biodersity on land and in the Sea" Geological Journal 36 (3-4): 211-230. doi: 10.1002/gj877

[4] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

২০১৫ সালের IUCN এর লাল তালিকা (Red list) অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩৮ প্রকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৯ প্রজাতির পাখি, ৩৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ১০ প্রজাতির অ্যাম্ফিবিয়ান, ৬৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ ১৩ প্রজাতির ক্রাসটেসিয়ান এবং ১৮৮ প্রজাতির প্রজাপতি হুমকির মুখে রয়েছে।

পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল বা এলাকা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সেইসব অঞ্চলকে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট বলে। ১৯৮৮ সালে ড. সাবিনা ভির্ক সর্বপ্রথম হটস্পট শব্দটি প্রথম প্রচলন করেন। মায়ার্সের মতে, বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক ৩৪টি হটস্পট রয়েছে[৫]। ব্রাজিলের আটলান্টিক উপকূলবর্তী বনাঞ্চল, মাদাগাস্কার দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপসমূহে উল্লেখযোগ্য হটস্পট রয়েছে।

মানচিত্র - ৫.১ বিশ্বের জীববৈচিত্র্যতার হটস্পটসমূহ [৬]

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্যের হটস্পটগুলোর মধ্যে রয়েছে পূর্ব হিমালয়, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মাইক্রোনেশিয়া, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, মালয়েশিয়ান উপদ্বীপ, মাদাগাস্কার, ইকুয়েডর, পেরু, কলম্বিয়া, আমাজোনিয়া ইত্যাদি। আফ্রিকার কঙ্গো, নাইজার ও জাম্বেসী নদী অববাহিকার গভীর অরণ্যে সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। মানচিত্র-৫.১ লক্ষ করুন। জীবকূলের ভিন্নতা এবং জটিল প্রতিবেশগত পরিবেশ জীবমণ্ডলকে একক (unique),

[5] Myers N (1990). "The biodiversity challenge: expanded hot -spots analysis" Environmentalist 10 (4): 243-256. doi. 10.1007/BF 02239720. PMID 12322583

[6] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

ও উৎপাদনশীল বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।[৭] জীববৈচিত্র্যতার ভিন্নতাও (Biodiversity varities) পৃথিবীকে সুন্দর এবং বাসযোগ্য রাখে।

টেবিল - ৫.২ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য জীববৈচিত্র্যতার হটস্পটসমূহের স্থানীয় প্রজাতি সংখ্যা[৮]

বিশ্বের জীববৈচিত্র্যতার হটস্পটসমূহ	স্থানীয় প্রজাতি সংখ্যা
ক্যালিফোর্নিয়া ফ্লোরিস্টিক প্রদেশ	২,১২৫ টি প্রজাতি
পলিনেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়া	৩,৩৩৪ টি প্রজাতি
মেসো আমেরিকান বন	৫,০০০ টি প্রজাতি
পশ্চিম নিরক্ষীয় অঞ্চল	২,২৫০ টি প্রজাতি
ক্রান্তীয় আন্দিজ	২০,০০০ টি প্রজাতি
কেন্দ্রীয় চিলি	১,৬০৫ টি প্রজাতি
কেপ্ ফ্লোরিস্টিক অঞ্চল	৫,৬৮২ টি প্রজাতি
গুনিয়াবন	২,২৫০ টি প্রজাতি
ককেশাস	১,৬০০ টি প্রজাতি
ইন্দো-বার্মা	৭,০০০ টি প্রজাতি
পশ্চিম ভারত এবং শ্রীলংকা	২,১৮০ টি প্রজাতি
সুন্দাভূমি	১৫,০০০ টি প্রজাতি
মাদাগাস্কার ভারত মহাসাগর	৮,৯০৪ টি প্রজাতি
দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	৪,৩৩১ টি প্রজাতি
ওয়ালিসিয়া	১,৫০০ টি প্রজাতি
দক্ষিণ কেন্দ্রীয় চায়না পর্বত	৩,৫০০ টি প্রজাতি
ফিলিপাইন	৫,৮৩২ টি প্রজাতি
মেডিটেরিয়ান বেসিন	১৩,০০০ টি প্রজাতি
ক্যরিবিয়ান আইল্যান্ড	৭,০০০ টি প্রজাতি
ব্রাজিলিয়ান চিরাডো	৪,৪০০ টি প্রজাতি
পশ্চিমের আর্ক পর্বত এবং উপকূলীয় বন তানজেনিয়া ও কেনিয়া	১,৪০০ টি প্রজাতি
আটলান্টিক বন	৬,০০০ টি প্রজাতি
গুইনিয়া আরচিপেলাগো	২,২৮০ টি প্রজাতি
নিউ ক্যালাডোনিয়া	২,৫৫১ টি প্রজাতি
নিউজিল্যান্ড	১,৮৬৫ টি প্রজাতি
সাচুলেন্ট কারো	১,৯৪০ টি প্রজাতি

[7] Tor- Biorn Larsson (2001). Biodiversity evolution tools for Europe forests. Wiley Blackwell. p 178 ISBN 978-87-16-16434-6

[8] Cunningham, W., & Cunningham, M. (2017). *Principles of Environmental Science Inquiry and Application* (8th ed.). Mc Graw Hill Education

সারসংক্ষেপঃ

জৈবিক বৈচিত্র্যতার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। ১৯৬৮ সালে রেমন্ড এফ ড্যাসমান Biodiversity শব্দটি ব্যবহার করেন। জীববৈচিত্র্যের ভিন্নতা পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। প্রধানত তিন ধরনের জীববৈচিত্র্যের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়; যথা- ১। প্রজাতি বৈচিত্র্য বা শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্য ২। বংশগতীয় বৈচিত্র্য এবং ৩। পরিবেশগত বৈচিত্র্য। বংশগতীয় বৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতি নির্বাচনে এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখে বংশগতীয় বৈচিত্র্য। বংশগতীয় বৈচিত্র্য পপুলেশনকে পরিবর্তনশীল পরিবেশেও খাপ খাওয়াইতে সহায়তা করে। প্রজাতি বৈচিত্র্য বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, অনুজীব প্রভৃতির মোট প্রজাতির সংখ্যাকেই বোঝায়। প্রজাতি বৈচিত্র্যের প্রধান দুটি অংশ। যথা- প্রজাতি প্রাচুর্য ও প্রজাতি সমতা। বাস্তুতান্ত্রিক বা প্রতিবেশভিত্তিক বৈচিত্র্যতা প্রত্যক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করে। যেমন প্রবাল প্রাচীর সমুদ্রের শতকরা ১ ভাগেরও কম জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এটি বিশ্বের শতকরা ২০ ভাগ লবণাক্ত পানির জীবের আবাসস্থল। এই প্রবাল প্রাচীরকে সমুদ্রের রেইনফরেস্টও বলা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জীববৈচিত্র্যতা দেখা যায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে (নিরক্ষরেখার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল), ক্রান্তীয় আদ্র জলবায়ুপুর্ণ অঞ্চলে এবং সমুদ্রের কোরাল রিফ অঞ্চলে। সর্বাপেক্ষা কম জীববৈচিত্র্য দেখা যায় মেরু অঞ্চলে। স্থলজ জীববৈচিত্র্য, মহাসাগরীয় জীববৈচিত্র্য অপেক্ষা প্রায় ২৫ গুণ বেশি। আবার উষ্ণমণ্ডলে নীতিশোতোষ্ণ মণ্ডলের তুলনায় জীববৈচিত্র্য অধিক। এছাড়াও সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়, মহাসাগরসমূহের মধ্য অক্ষাংশে অর্থাৎ যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির তাপমাত্রা অধিক। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলেও অধিক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল বা এলাকা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সেইসব অঞ্চলকে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট বলে। ১৯৮৮ সালে ড. সাবিনা ভির্ক সর্বপ্রথম হটস্পট শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। মায়ার্সের মতে, বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক ৩৪টি হটস্পট রয়েছে।

পাঠ-৫.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
Biodiversity Conservation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণের ধরন বলতে পারবেন;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক কারণে ইকোসিস্টেমে বা প্রতিবেশে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তি প্রতিবেশের প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু বর্তমানে দ্রুত নগরায়ণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রজাতি বিলুপ্তির (Extinction) হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ১৬০০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রতি দশকে দুই থেকে তিনটি প্রজাতির বিলুপ্ত হতো। পরবর্তীতে তা বেড়ে প্রতিদশকে ১০০টি হয়ে যায়। Paul Ehrlich এর একটি প্রাক্কলন (estimation) থেকে বলা যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান প্রজাতির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে ধারণা[৯]। ২০১৫ সালের IUCN এর লাল তালিকা (Red list) অনুযায়ী বাংলাদেশে হুমকির সম্মুক্ষীণ মোট ১,৬১৯টি প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়েছে; তন্মধ্যে ৩১টি প্রজাতি আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত ৫টি প্রজাতি, গুরুতর বিপন্ন ১৮১ প্রজাতি, বিপন্ন ১৫ টি প্রজাতি, ক্ষতিগ্রস্ত ৯০ টি প্রজাতি এবং ৮০২ টি প্রজাতি হুমকির মুখে।

জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ
Causes of Biodiversity Loss

পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে টিকে থাকতে না পারলে প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তি এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। ইকোসিস্টেমে বা প্রতিবেশে নতুন প্রজাতি আগমনের ফলে প্রাকৃতিক কারণে প্রজাতির যে বিলুপ্তি ঘটে তা প্রাকৃতিকভাবে সাধারণত পূরণ হয়ে যায়। এটি বিবর্তনের সাধারণ একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। সাধারণত প্রধান দুটি কারণে জীববৈচিত্র্যে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। যথা:

১। প্রাকৃতিক কারণ: ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, খরা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি।
২। মানবসৃষ্ট কারণ: আবাসস্থল বিনষ্টকরণ, শিকার, দূষণ, বহিরাগত প্রজাতির আগমণ, পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি ।

১। প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes): জীববৈচিত্র্যে প্রজাতি বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী খরা, প্রাকৃতিকভাবে বনভূমিতে দাবানল, উল্কাপাত, অগ্ন্যুৎপাতের লাভা, ভূমিকম্প ও ভূ-আলোড়ন প্রভৃতি। বিজ্ঞানীদের ধারণা ক্রেটাসিয়াস যুগে পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ৫০ শতাংশ এবং ডাইনোসর পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এছাড়া ভূ-তাত্ত্বিক মাপনী অনুসারে ২৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে পার্মো কার্বোনিফেরাস হিমবাহকরণের ফলে গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের জীব সম্প্রদায়ের প্রায় ৫৪ শতাংশ গোত্র এবং ৯০ শতাংশ প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এছাড়াও বনভূমিতে দাবানল, দীর্ঘস্থায়ী খরা, বন্যা প্রভৃতি ইকোসিস্টেমে বা প্রতিবেশে ব্যাপক প্রভাব ফেলে যার দরুন জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটে।

[9] Alam, k. (2014). *Physical Geography of the Global Environment* (1st ed.). Perfect Publications.page-1101.

২। মানবসৃষ্ট কারণ (Arthropogenic Causes): মানুষের কার্যাবলির ব্যাপকতার কারণে বর্তমানে জীববৈচিত্র্য অনেকটাই হুমকির সম্মুখীন। মানবসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আবাসস্থল বিনষ্টকরণ, অতিশোষণ, দূষণ, বহিরাগত প্রজাতির প্রবেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ক. আবাসস্থল বিনষ্টকরণ (Habitat Destruction): প্রজাতি বিলুপ্তির প্রধান একটি কারণ হলো প্রজাতির আবাসস্থলের ক্ষতিসাধন। বনাঞ্চল কেটে নগরায়ন বৃদ্ধি করলে কিছু প্রজাতির আবাসস্থল পরিবর্তনের কারণে আবাসস্থল ভেঙ্গে ছোটো হয়ে যায়। এই ধরনের আবাসস্থল ছোটো করাকে বলা হয় আবাসন ফ্র্যাগমেনটেশন (Habitat Fragmentation) । এই ক্ষেত্রে বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবাসন কমে যায়। এছাড়াও বনভূমির মাঝে রাস্তা তৈরি, খনিজ সম্পদ আহরণ, বনজসম্পদ আহরণ, শিল্পকারখানা স্থাপন, বনভূমি কেটে কৃষিকাজ প্রভৃতি বনভূমির প্রতিবেশে প্রজাতির ক্ষতিসাধন করে। লবণাক্ত পানির স্রোতজ বনভূমি কিছু প্রজাতির নিরাপদ আবাসস্থল হলেও বর্তমানে উপকূলীয় আঞ্চলের বিভিন্ন কার্যক্রম (মৎসচাষ) প্রজাতির বিস্তারে বাঁধা সৃষ্টি করছে। বননিধন ও বিনষ্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রজাতির আবাসস্থলের আবাসস্থলের ক্ষতিসাধন ।

খ. অতিশোষণ (Over exploitation): নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করে এবং বন্যপ্রাণী হত্যা করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে টিকে থাকার অর্থাৎ অস্তিত্বের জটিল সীমানায় পৌঁছে দেওয়াকে অতিশোষণ (Over exploitation) বলে। দুর্লভ প্রাণীর চামড়া, হাড়, দাঁত ইত্যাদির অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় নির্বিচারে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার চলছে। যেমন- হাতির দাঁত, গণ্ডারের চামড়া ও শিং, বাঘের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় নির্বিচারে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার চলছে। এই কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা এইসব প্রাণীকে সংকটাপূর্ণ প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাইসন ছিল ৬০ মিলিয়ন, ১৮৯০ সালে মাত্র ৪০০ এবং নির্বিচারে নিধনের ফলে বর্তমানে এটি বিরল প্রজাতি। একইভাবে, বাংলাদেশের সুন্দবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

গ. পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution): মৃত্তিকা, পানি, বায়ু দূষণের ফলে প্রতিবেশের জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অধিক পরিমাণে পানি দূষণের ফলে অনেক নদীই জীব মরুভূমিতে (Biological desert) পরিণত হয়। যেমন- পানি দূষণের ফলে বুড়িগঙ্গা নদী জীব মরুভূমিতে (Biological Desert) পরিণত হয়েছে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগে মৃত্তিকার দূষণ বাড়ে। দূষিত রাসায়নিক পদার্থ খাদ্য-শৃঙ্খলে প্রবেশ করে। এছাড়াও এসিড বৃষ্টির কারণে এসিড বৃষ্টির সালফার ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের ব্যাপক ক্ষতি করে। যেমন- নরওয়ে এবং সুইডেনের হ্রদগুলোতে এসিড বৃষ্টির ফলে জীবসম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। এসিড বৃষ্টিকে প্রায় হ্রদ হত্যাকারী (Lake killers) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ঘ. বহিরাগত প্রজাতি (Exotic Species): ইকোসিস্টেমে বহিরাগত প্রজাতির আগমণ হুমকিস্বরূপ। কারণ বহিরাগত নতুন প্রজাতি নতুন পরিবেশের সাথে দ্রুত অভিযোজন করে, অধিক পরিমাণে মৃত্তিকার আদ্রতা ও পুষ্টি গ্রহণ করে। যেমন- বাংলাদেশে ইউকিলিপটাস প্রজাতির বিভিন্ন বৃক্ষের আগমণের পরবর্তী সময়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করলেন- ইউকিলিপটাস গাছ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অস্ট্রেলিয়ায় স্থানীয় ঘাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউরোপ থেকে খরগোস নিয়ে আসে কিন্তু পরবর্তীতে খরগোশের বংশ বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউরোপ থেকে শিয়াল আনতে হয়েছিল। এছাড়াও মানুষ এবং বাণিজ্যিক পণ্যের এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবহনের কারণে অনুজীব নতুন স্থানে পরিবাহিত হয়ে বংশ বিস্তার করে। যেমন- সারাবিশ্বে কোভিড ১৯ নামক মহামারির বিস্তার।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

Conservation of Biodiversity

১৯৫০ সাল থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম গুরুত্ব সহকারে উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ব্রাজিলের রিও দ্যা জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রি সম্মেলনে। ইউনিট - ১১ তে ধরিত্রি সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশল স্বল্প, মধ্যম বা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। প্রতিবেশের কোন উপাদানটি সংরক্ষণ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে সংরক্ষণের কৌশল। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ধরন নির্ভর করে উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংখ্যা, আকার, জীবনচক্র, অনুজীবের প্রজননের ধরন এবং প্রতিবেশের প্রকৃতির ওপর ।

জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের ধরন

Types of Biodiversity Conservation

জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষনের ধরণ প্রধানত দু'প্রকারের, যথা-

১। ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-Situ Conservation)
২। এক্স-সিটু সংরক্ষণ (Ex-Situ Conservation)

১। ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-Situ Conservation): যে কোনো প্রজাতি জীবমণ্ডলে যে পরিবেশ ও অবস্থায় জন্মায়, সেই পরিবেশে ঐ প্রজাতির সংরক্ষণের ধরনকে ইন-সিটু সংরক্ষণ বলে। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থলকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানসহ অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জৈব ও অজৈব সম্পদ আহরণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত প্রজাতির প্রাকৃতিক বিবর্তন হতে পারে। চাষ করা বা আবাদি উদ্ভিদের জন্য ইন-সিটু পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

২। এক্স-সিটু সংরক্ষণ (Ex-Situ Conservation): এই পদ্ধতিতে প্রজাতিসমূহকে তাদের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ থেকে সরিয়ে পৃথক কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করাকে বোঝায়। যেমন- বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, জেনেটিক রিসোর্স সেন্টার ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া

Process of Biodiversity Conservation

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমকে সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রতিবেশের বিপদগ্রস্থ স্বতন্ত্র প্রজাতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন-গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ, অস্ট্রেলিয়া (Great Barrier Reef in Australia) । জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়াকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা-

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান চারটি প্রক্রিয়া হলো-

১. ক্যাপটিভ ব্রিডিং (Captive Breeding)
২. আবাসস্থল সংরক্ষণ (Habitat Conservation)
৩. আইন এবং চুক্তি (Laws and Treaties)
৪. প্রজাতির শ্রেণিবিভাজন (Species Classification)

১। ক্যাপটিভ ব্রিডিং (Captive Breeding): প্রজাতি সংরক্ষণে ক্যাপটিভ ব্রিডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পাখি ক্যালিফোর্নিয়া কনডোরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল ক্যাপটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে। ১৯৮৪ সালে যেখানে ১৫টি ক্যালিফোর্নিয়া কনডোর ছিল সেখানে বর্তমানে এর সংখ্যা ২০০ টিরও বেশি। প্রজাতি সংরক্ষণে ক্যালিফোর্নিয়া কনডোরের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। প্রজাতি সংরক্ষণে চিড়িয়াখানায় এনে ক্যাপটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে প্রাণীর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

২। আবাসস্থল সংরক্ষণ (Habitat Conservation): ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ প্রতিনিধিত্ব এলাকা বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষণ করাকে আবাসস্থলের সংরক্ষণ বলে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সর্বাধিক কার্যকরী উপায় হলো সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমের সংরক্ষণ করা। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৭০০০ এর বেশি প্রাকৃতিক পার্ক এবং আবাসস্থল রয়েছে। বাংলাদেশেও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সনাক্ত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। আইন এবং চুক্তি (Laws and Treaties): বনভূমি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। আইন এবং চুক্তি বনভূমি রক্ষায় এবং স্বতন্ত্র প্রজাতি সুরক্ষায় সহায়ক হতে পারে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের বিপন্ন প্রজাতি সুরক্ষায় আইন প্রয়োগ করে কুমির এবং সমুদ্রের সবুজ কচ্ছপ সংরক্ষণ করেছিল । আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিও সম্মেলনে প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণ এবং পুরনো বনভূমিগুলো সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য চুক্তিতে প্রধান তিনটি বিষয় গুরুত্ব পায়। যথা–

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার টেকসই করতে হবে।
- জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুফল যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সংগত হতে হবে।

৪। প্রজাতির শ্রেণিবিভাজন (Speceies Classification): প্রজাতির সংরক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রজাতির শ্রেণিবিভাজন জরুরি। যেমন- ১৯৮৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অব ন্যাচার এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্স (Internation Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) সেন্টার প্রজাতির টিকে থাকার ঝুঁকির মুখে রয়েছে এমন বিভিন্ন শ্রেণির প্রজাতির একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। প্রজাতি সংরক্ষণে এ তালিকাটিকে রেড ডাটা লিস্ট (Red Data List) বা লাল তালিকা বলা হয়। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বর্তমানে পরিবশগত পরিবর্তনের কারণে বহু প্রজাতি আঞ্চলিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রজাতি ।

২০০৪ সালে লাল তালিকা সংস্করণে নিম্নলিখিত প্রজাতি শ্রেণিবিভাজন করা হয়। যথা-

- কম গুরুত্বপূর্ণ (Least Concern; LC): পৃথিবীর সব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এরূপ প্রজাতিসমূহকে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- হুমকীর সম্মুক্ষীন প্রজাতি (Near Threatened Species, NT): যে সব প্রজাতি ঝুঁকিগ্রস্ত শ্রেণির থেকে কম কিন্তু উচ্চমাত্রায় পপুলেশন হারাচ্ছে, সেগুলোকে হুমকীর সম্মুখীন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ঝুঁকিগ্রস্ত প্রজাতি (Vulnerable Species, VS): বিগত ১০ বছরে যেসব প্রজাতি তাদের জনসংখ্যার ৫০% হারিয়েছে তাদেরকে ঝুঁকিগ্রস্ত প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- বিপন্ন প্রজাতি (Endangered Species, EN): বিগত দশ বছরের মধ্যে যে সব প্রজাতির পপুলেশনের ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এরূপ প্রজাতিসমূহকে বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় রাখা হয়েছে।
- সংকটাপন্ন প্রজাতি (Critically Endangered Species, CR): বিগত ১০ বছরের মধ্যে যে সকল প্রজাতি তাদের মোট পপুলেশনের ৮০ শতাংশ বিলুপ্ত করেছে তাদেরকে সংকটাপন্ন প্রজাতি বলে।
- বিরল প্রজাতি (Extinct Wild Species; EW): এখনো কোনা প্রজাতি প্রাকৃতিক বা বন্য পরিবেশে দেখা যায় না কিন্তু মানুষের ব্যবস্থাপনায় কোনো কোনো অঞ্চলে টিকে আছে সেইক্ষেত্রে এরূপ প্রজাতিকে বিরল প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- বিলুপ্ত প্রজাতি (Extinct Species; EW): উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে সব প্রজাতি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে, এই রূপ প্রজাতিকে বিলুপ্ত প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

Process of Biodiversity Conservation

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এবং অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুক্ষীণ। বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমান ২.৬ মিলিয়ন হেক্টর যা বাংলাদেশের মোট ভূমির ১৭.৪ শতাংশ। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে রক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৬,৩৬,৩৯০.৪৬ হেক্টর। যা দেশের মোট আয়তনের ৪.১৩ শতাংশ (বন অধিদপ্তর,২০২০)। এছাড়াও রয়েছে বিশেষ তিনটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন এলাকা। সংরক্ষিত তিনটি এলাকা হলো- রাতারগুল (সিলেট), আলতাদীঘি নওগাঁ এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গাজীপুর জেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, চট্টগ্রাম জেলায় শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারী অ্যান্ড ইকোপার্কসহ ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি অভয়ারণ্য এবং এবং বিভাগ অনুযায়ী শকুনের নিরাপদ প্রজনন ও সংরক্ষণ এলাকা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। যথা- সুন্দরবন, কক্সবাজার টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, মারজাত বাওড়, গুলশান - বারিধারা লেক, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী এবং জাফলং - ডাউকি নদী প্রভৃতি। বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যে সকল কার্য নিষেধ করা হয়েছে তা হলো-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা আহরণ ও নিধন নিষেধ

- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা নিষেধ
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসকারী সবধরনের কার্য নিষেধ
- এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা পরিবর্তন হতে পারে
- প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না
- নদী, জলাশয়, লেক, জলাভূমিতে বসতবাড়ি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালীসৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য ফেলা নিষেধ।

বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা

Ecologically Critical Area Management

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কতিপয় ব্যবস্থাপনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণ:** পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, 'সুন্দরবন'। এর আয়তন প্রায়, ৬,০১,৭০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.১৩ শতাংশ। সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষায় এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিকাশের জন্য কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপে ও টেকনাফ এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন বা প্যারাবন তৈরি করা হয়েছে। এই বন বন্যপ্রাণী, জলজ প্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল হিসেবেও প্রতিবেশকে সংরক্ষণ করে।

২. **সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন:** জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সৃষ্ট অভিঘাত প্রশমনে স্থানীয় কৃষকদের সেচ সুবিধায় সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. **প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ:** প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ - প্রতিবেশ - জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে। যেমন- হাকালুকি হাওড়ে ছয়টি এবং কক্সবাজারে চারটি মোট দশটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. **পরিবেশ টাওয়ার নির্মাণ:** প্রাকৃতিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় পাহারার জন্য এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য হাকালুকি হাওরে দুইটি এবং কক্সবাজারে দুইটি পরিবেশ টাওয়ার নামে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ:

যে কোনো (বৃহৎ বা ক্ষুদ্র) প্রতিবেশে প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পাওয়াকে জীববৈচিত্র্য হ্রাস বলে। প্রধানত দুইটি কারণে (মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক) জীববৈচিত্র্যের হ্রাস ঘটে। মানবসৃষ্ট কারণসমূহ হলো- আবাসস্থল বিনষ্টকরণ, অতি শোষণ, পরিবেশ দূষণ ও বহিরাগত প্রজাতির প্রতিস্থাপন। জীববৈচিত্র্য হ্রাসের প্রশমনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের প্রধান ধরন দুটি হলো- ইন-সিটু সংরক্ষণ এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণ । ইন- সিটু সংরক্ষণে প্রাকৃতিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা হয়। যেমন- অস্ট্রেলিয়ার কোরাল রিফ। এক্স- সিটু সংরক্ষণে প্রতিবেশকে মানুষ তৈরি করে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। যেমন- বাংলাদেশের সিলেটের রাতারগুল শোয়াম ফরেস্ট। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের চারটি প্রধান প্রক্রিয়া রয়েছে। যথা- ক্যাপটিভ ব্রিডিং, আবাসস্থল সংরক্ষণ, আইন এবং চুক্তি, প্রজাতির সংরক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রজাতির শ্রেণিবিভাজন। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। যথা- সুন্দরবন, কক্সবাজার টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, মারজাত বাওড়, গুলশান - বারিধারা লেক, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী এবং জাফলং-ডাউকি নদী প্রভৃতি। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা। প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কতিপয় ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। যথা- ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণ, সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ ও পরিবেশ টাওয়ার নির্মাণ প্রভৃতি।

পাঠ-৫.৩ টেকসই উন্নয়নের ধারণা
Concepts of Sustainable Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি বর্ণনা করতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উন্নয়ন একটি পরিবর্তন এবং গতিশীল ধারণা। উন্নয়ন বহুবিধ বিষয়কে সম্পৃক্ত করে। যেমন- অর্থনীতিতে উন্নয়নের অর্থ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃত্তি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এর অর্থ গণতন্ত্রের চর্চা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, সমাজবিজ্ঞানে এর অর্থ জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা এবং পরিবেশ বিজ্ঞানে এর অর্থ সুষ্ঠু প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখা। মূলত: উন্নয়ন হলো একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া (Multidimensional Process) যা সকল দিক থেকে মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে।

পরিবেশ এবং উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত। পরিবেশগত সংকট যেমন পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি উন্নয়নের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত করে কখনো বাঁধাগ্রস্ত করে। অন্যদিকে উন্নয়নগত কারণে যেমন বন নিধন, বন্যপ্রাণী শিকার, অধিক পরিমাণে অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার পরিবেশগত সংকট বা সমস্যাসমূহকে ত্বরান্বিত করছে এবং প্রকট করছে। তাই পরিবেশ এবং উন্নয়ন উভয়কে সমুন্নত রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) সূচনা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নততর বৈশ্বিক পরিবেশ তৈরিতে টেকসই উন্নয়নের বিকল্প নেই।

টেকসই উন্নয়ন
Sustainable Development

টেকসই উন্নয়ন এমন এক উন্নয়ন ধারা নির্দেশ করে যা জীবের বসবাসকৃত পরিবেশ, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উন্নয়নের ধারাকে প্রবাহমান রাখে। Sustainable Development এই ইংরেজি শব্দদ্বয়ের কোনো সর্বজন গ্রাহ্য বাংলা পরিভাষা না থাকায় একে স্থায়ী উন্নয়ন, বহতা উন্নয়ন, প্রবাহমান উন্নয়ন, প্রবাহী উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতি শব্দসমষ্টির পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়[১০]। সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি না করে ভবিষ্যতে সম্পদ প্রাপ্যতা নিশ্চিত সাপেক্ষে যে উন্নয়ন মানব সভ্যতার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে সেই ধরনের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

[10] Rouf, D., & Illius, S. (2005). *Environment and Resource Management* (3rd ed.). shujoneshu Prokashony.

- টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে Allen (১৯৮০) বলেন, "A development that is likely to achieve lasting satisfaction of human needs and improvement of quality of human life. " অর্থাৎ "টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে মানব জীবনের গুনগত মানের এবং মানুষের চাহিদা পূরণে স্থায়ী সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যবস্থা"।
- Dictionary of Ecology তে বলা হয়েছে টেকসই উন্নয়ন হলো- অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা অর্থনৈতিক কার্যাবলির পরিবেশগত পরিণতির পূর্ণ বিবেচনা করে এবং সেই সব সম্পদের ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে যা প্রতিস্থাপনযোগ্য ও পুনঃনবায়নযোগ্য, সুতরাং সেগুলোর বিনাশ হয় না।
- Robert Repetto (১৮৮৬) বলেন, "Sustainable development is a development strategy that manages all assets, natural resources and human resources as well as financial and physical assets for increasing long term wealth and wellbeing"। অর্থাৎ "টেকসই উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বোঝায়, যা দীর্ঘকাল স্থায়ী সম্পদ ও প্রতিপত্তি সৃষ্টি এবং উন্নয়নের জন্য সকল প্রকারের প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদসমূহের এবং অর্থনৈতিক ও ভৌত সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করে।"
- Jannifer A. Elliott এর মতে, Sustainable development is a concept which encompasses the inter development goals of development and environmental conservation. অর্থাৎ "টেকসই উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রত্যয় যা উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের আন্তঃনির্ভরশীল লক্ষ্যগুলোকে পরিবেষ্টন করে। "
- বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়ন কমিশন (World Commision an Environment and Development - WCED) এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রান্টল্যান্ড (Brundtland) এর মতে, "Sustainable development is a development that meets the present generation without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs" অর্থাৎ "টেকসই উন্নয়ন হলো সেই উন্নয়ন যা ভবিষ্যত প্রজন্মের সম্পদের চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, বর্তমান প্রজন্মের সম্পদের চাহিদা পূরণ করে। "

সংক্ষেপে, পার্থিব পরিবেশকে বিঘ্নিত না করে মানব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদাপূরণ করতে সক্ষম গতিশীল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যবস্থাকেই টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) বলা হয়। সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি না করে ভবিষ্যতে সম্পদ প্রাপ্যতা নিশ্চিত সাপেক্ষে যে উন্নয়ন মানব সভ্যতার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে সেই ধরনের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি

Basic of Sustainable Development

প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে টেকসই উন্নয়ন। চিত্র-৫.২ লক্ষ করুন। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ায় তৈরি হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ। তাই এই তিনটি পরিবেশকেই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিবেশগত উন্নয়নের সক্ষমতা তৈরি করে অপরদিকে এই প্রবৃদ্ধি পরিবেশগত কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কি না তাও নির্ণয় করে।

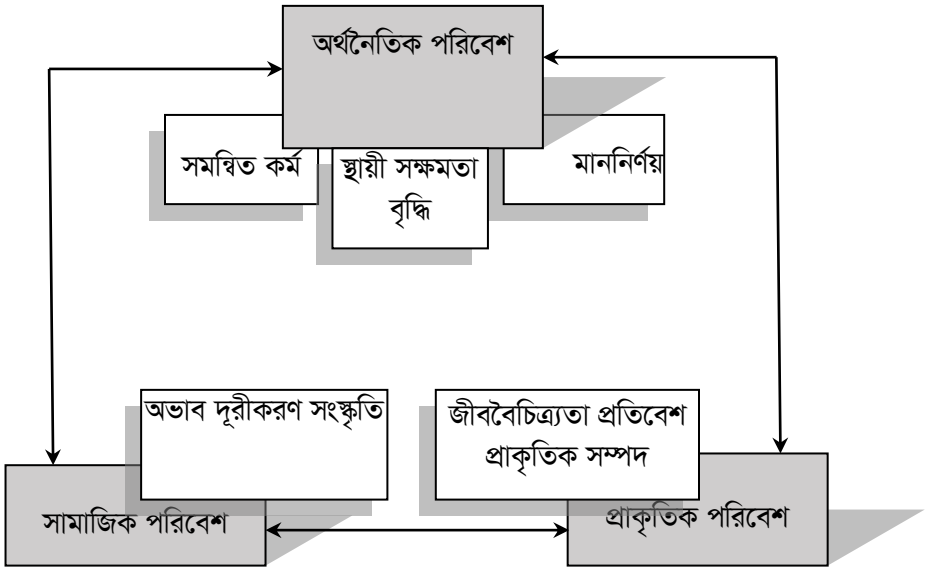

চিত্র - ৫.২ টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সমন্বয় কেমন এবং তা কী ধরনের সামাজিক প্রভাব ফেলছে তা দেখতে হবে। পরিবেশগত উপাদানসমূহের পরিমাপ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কি না দেখতে হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের ফলে যে কোনো একটির উন্নয়নে অপরটি যেন বাঁধাগ্রস্ত না হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দ্রুত নগরায়নের জন্য গাছ না লাগিয়ে যদি অধিকহারে গাছ কাটা হয় তা অবশ্যই পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সুভাস কে. শিকদার টেকসই উন্নয়নের প্রধান এই তিনটি প্রপঞ্চকে তিনটি পরস্পর বিভক্তকারী বৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। চিত্র-৫.৩ লক্ষ করুন।

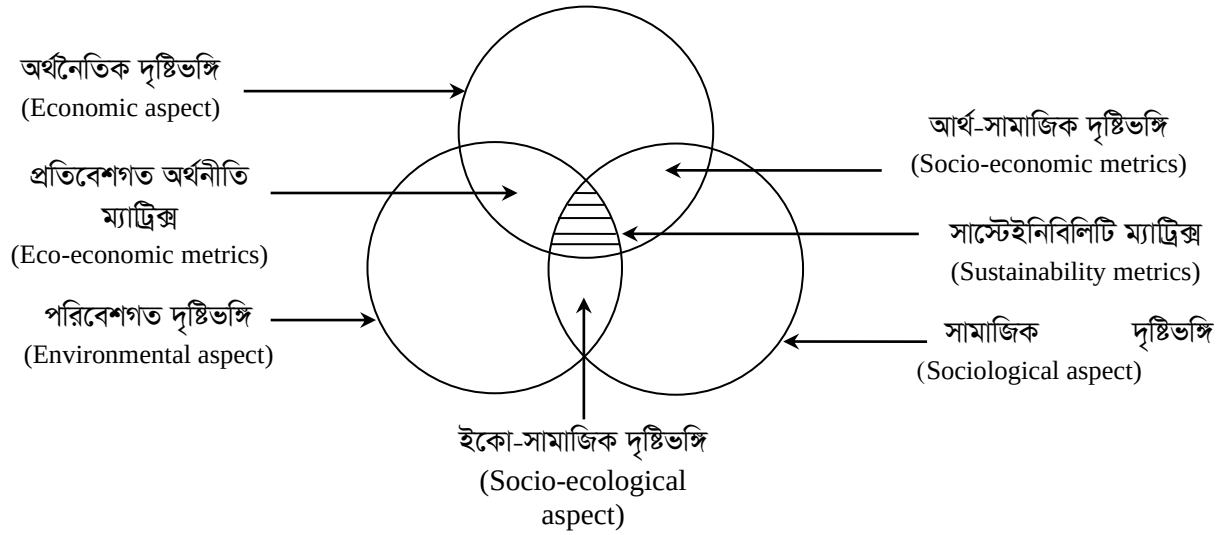

চিত্র - ৫.৩ টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি উৎস: শিকদার, এস.কে (২০০৪)

টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া

Sustainable Development Process

সুভাস কে. শিকদার টেকসই উন্নয়নের প্রধান চারটি ধরন চিহ্নিত করেছেন। চিত্র-৫.৪ লক্ষ করুন।

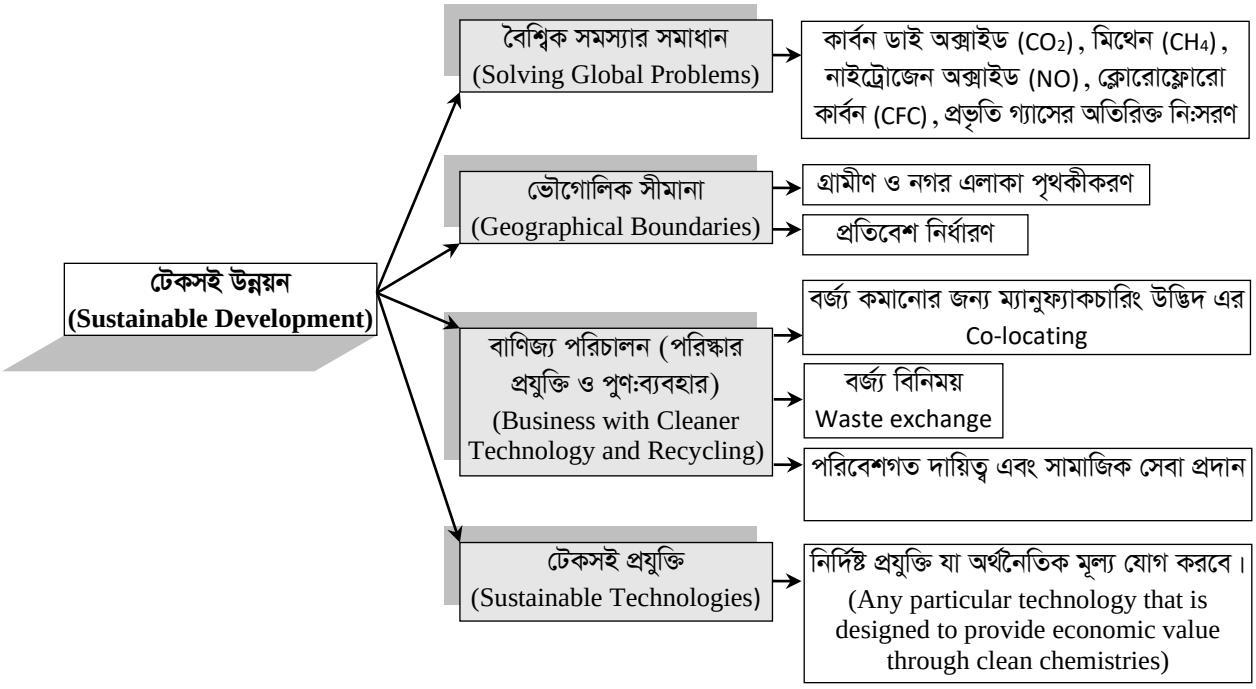

চিত্র - ৫.৪ টেকসই উন্নয়নের প্রধান চারটি ধরণ

টেকসই উন্নয়নের প্রধান চারটি ধরন হলো - বৈশ্বিক দূষণ সমস্যার সমাধান (Solving Global Problems), নগর-গ্রামীণ ও প্রতিবেশগত ভৌগোলিক সীমানা (Geographical Boundaries) নির্ধারণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রযুক্তি এবং পুনঃব্যবহার অনুশীলন প্রাধান্য দিয়ে বাণিজ্য পরিচালন (Business with Cleaner Technology and Recycling) ও টেকসই প্রযুক্তি (Sustainable Technologies) নির্ধারণ প্রভৃতি।

সারসংক্ষেপ:

পরিবেশ এবং উন্নয়ন উভয়কে সমুন্নত রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) সূচনা। টেকসই উন্নয়ন হলো সেই উন্নয়ন যা ভবিষ্যত প্রজন্মের সম্পদের চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বর্তমান প্রজন্মের সম্পদের চাহিদা পূরণ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের ফলে যে কোনো একটির উন্নয়নে অপরটি যেন বাঁধাগ্রস্ত না হয়। এছাড়াও উক্ত তিনটি পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি টেকসই উন্নয়নের দীর্ঘ স্থায়িত্বের ম্যাট্রিক্স তৈরি করে। সুভাস কে. শিকদার টেকসই উন্নয়নের প্রধান চারটি ধরন চিহ্নিত করেছেন। যথা- বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান, ভৌগোলিক সীমানা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রযুক্তি এবং পুনঃব্যবহার অনুশীলন প্রাধান্য দিয়ে বাণিজ্য পরিচালন ও টেকসই প্রযুক্তি। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নততর টেকসই বৈশ্বিক পরিবেশ তৈরিতে টেকসই উন্নয়নের বিকল্প নেই।

পাঠ-৫.৪ টেকসই উন্নয়নের নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা
Principles and Goals of Sustainable Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টেকসই উন্নয়নের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) ধারণাটি ১৯৭২-১৯৯২ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে সভা, সেমিনার এবং কনফারেন্সের মাধ্যমে অধিক পরিচিত হয় (United Nations, 2010)। স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানব পরিবেশ বিষয়ক কনফারেন্সে (UN Conference on Human Environment) ১৯৭২ সালে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক এজেন্সি UNEP Ges International Union for the Conservation of Nature, World Wildlife Fund (WWF) সমন্বিত ভাবে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রাধান্য দেয়। ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯২ এ 'এজেন্ডা ২১' অনুযায়ী পরিবেশ প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি সাধন না করে এবং মানব সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের কোনোরূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মানব জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনকেই টেকসই উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

- **পরিবেশিক ভারসাম্যের সাথে সমন্বয় করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নতির অন্যতম শর্ত। এরূপ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতি ব্যহত করা যাবে না এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা যাবে না।
- **প্রতিবেশ অবিকৃত রাখা:** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকৃতির ওপর মানুষকে নির্ভর করতে হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা টেকসই উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। পরিবেশ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বিষয়গুলো চিহ্নিত করে প্রতিরোধ করতে হবে।
- **বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের উন্নতি নিশ্চিত করা:** বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার করে অর্থনৈতিক উন্নতি এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে পরিবেশগত বিপর্যয় না ঘটে। এই লক্ষ্যে সম্পদ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমাতে হবে। পুরাতন কাগজ, স্ক্র্যাপ, অর্থাৎ ব্যবহৃত দ্রব্যের পুনঃব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, অপচয় রোধ করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য সম্পদ যেমন সৌরশক্তি, বাতাস, পানি, ভূ-তাপীয় শক্তিসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- **দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা:** শিল্পকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া, শিল্পের বর্জ্য পদার্থ দ্বারা মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ রোধ করতে হবে। দূরারোগ্য ব্যধির আক্রমণ রোধ, অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বনকর্তন রোধ করতে হবে। এই লক্ষ্যে বন নবায়ন ও ভূমিক্ষয় রোধ করতে হবে। কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত করতে হবে।
- **নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন:** পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনে জোর দিতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। খনিজ সম্পদের

পরিবর্তে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পানি, বিদ্যুৎ, জৈব গ্যাস প্রভৃতি নবায়নযোগ্য ও পূরণশীল শক্তিগুলোর ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০

Sustainable Development Goal-2030

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশ উন্নয়নের জন্য টেকসই উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০০০ সালে অতিদারিদ্র দূর করার জন্য পর্যন্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে সার্বজনীন, উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সব দেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ গ্রহণ করেছে। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- ২০৩০ নির্ধারিত হয়। জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্রের শিরোনাম হচ্ছে, "Transforming our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development" অর্থাৎ বদলে দেই আমাদের পৃথিবী : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০। United Nations, ২০১৫ অনুযায়ী, টেকসই উন্নয়নে - সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহের সুষম সমন্বয় শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল। টেকসই উন্নয়নের কতিপয় লক্ষ্যসমূহ হলো- দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, নারী পুরুষ সমতা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, যথোপযুক্ত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পউদ্ভাবন ও অবকাঠামো, বৈষম্য হ্রাস, টেকসই নগর ও সমাজ, দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন জলবায়ু কার্যক্রম, জলজ জীবন, স্থলজ জীবন, শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং লক্ষ্য পূরণ ও অংশীদারিত্ব । টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- ২০৩০ এ ১৭ টি উন্নয়ন লক্ষ্য ও ১৬৯ টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধানত পাঁচটি পি (P) এর ওপর ভিত্তি করে (চিত্র-) টেকসই উন্নয়ন- ২০৩০ তৈরি করেছে।

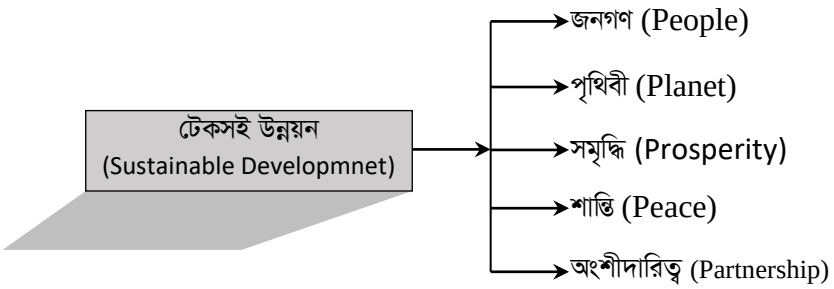

চিত্র - ৫.৫ টেকসই উন্নয়নের পাঁচটি পি (P) ধারণা

১। জনগণ (People): সকল মানুষ তাঁর সম্ভাবনায় সম্মানজনকভাবে ও সমতার ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে।

২। পৃথিবী (Planet): বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পৃথিবী তাঁর সম্পদ সংরক্ষণ করবে।

৩। সমৃদ্ধি (Prosperity): পরিবেশের সাথে ভারসাম্য রেখে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে।

৪। শান্তি (Peace): ভয় ও সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ, ন্যায্য ও একীভূত সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক মহল গড়ে তুলতে হবে।

৫। অংশীদারিত্ব (Partnership): আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডে সকল দেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান এবং একই সাথে উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারক। টেকসই উন্নয়ন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও পরিবেশের যথার্থ মান নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জৈবিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নয়নকে টেকসই করে।

সারসংক্ষেপঃ

১৯৭২ সালে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক এজেন্সি সমন্বিত ভাবে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রাধান্য দেয়। "বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিশন" টেকসই উন্নয়নের ধারণাকে বিশ্বব্যাপী সর্বজন গ্রাহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯২ এ 'এজেন্ডা ২১' অনুযায়ী পরিবেশ প্রতিবেশের কোন ক্ষতি সাধন না করে এবং মানব সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের কোনোরূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মানব জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনকেই টেকসই উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীতে প্রধান পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ নির্ধারণ করা হয়। এই পাঁচটি বিষয়কে পাঁচ পি (p) ও বলা হয়। যথা- জনগণ, পৃথিবী, সমৃদ্ধি, শান্তি, এবং অংশীদারিত্ব। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০ এর ১৭ টি উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ১৬৯ টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান এবং একই সাথে উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারক। টেকসই উন্নয়ন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও পরিবেশের যথার্থ মান নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জৈবিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নয়নকে টেকসই করে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে? জীববৈচিত্র্যতা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন।
২. প্রজাতি নির্বাচনে এবং পরিবর্তনশীল প্রতিবেশে প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে বংশগতীয় বৈচিত্র্যতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্য বা প্রজাতি বৈচিত্র্য কাকে বলে?
৪. প্রতিবেশগত বৈচিত্র্যতা বলতে কী বোঝায়?
৫. বিশ্বের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।
৬. জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মানবসৃষ্ট কারণসমূহ লিখুন।
৭. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
৮. ইন-সিটু এবং এক্সসিটু সংরক্ষণ কাকে বলে?
৯. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ কী কী? আলোচনা করুন।
১০. প্রজাতির শ্রেণিবিভাজন কেন করা হয়? আপনার মতামত লিখুন।
১১. প্রজাতি শ্রেণিবিভাজনে লাল তালিকা বলতে কী বোঝায়? লাল তালিকা অনুসারে প্রজাতির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
১২. বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ কী কী?
১৩. টেকসই উন্নয়ন কাকে বলে?
১৪. টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি ভিত্তি কীভাবে সম্পর্কিত বলে আপনি মনে করেন?
১৫. টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি কী কী?
১৬. টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রধান চারটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।
১৭. টেকসই উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?
১৮. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- ২০৩০ বর্ণনা করুন।
১৯. টেকসই উন্নয়নের পাঁচটি পি (P) কী কী?